আত্মপরিচয়ের সংগ্রাম

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

খালিদ হোসেন

আইএফডি এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ সিরিজ
ইন্টারভিউ ২
অক্টোবর ১, ২০১৪

ভূমিকা

২০১২ সালের ১৫ জুন মিয়ানমারের শরণার্থীদের বাংলাদেশে আশ্রয় দেয়ার আবেদন জানিয়ে আমরা একটি বিবৃতি প্রচার করেছিলাম। এই বিষয়ে আমরা উদ্যোগটি নিয়েছিলাম সম্পূর্ণ মানবিক কারণে। আসলে ঐ ছবিটাই বদলে দিয়েছিল সবকিছু। আমাদের কাছে মনে হয়েছিল, হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকা যে বাবাটি আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করছেন, তার এই বিপদের দিনে আমরা যদি কিছু করতে না পারি, তাহলে মানবতা, গবেষণা, উন্নয়ন এবং নানা রকম আইডিয়া নিয়ে কথা বলাটার আসলে কোন মূল্য নেই।

এই বিবৃতি প্রচারের পর আমাদের মনে হতে থাকে মিয়ানমারের শরণার্থীদের নিয়ে কথা বললেও আমাদের কখনো কিন্তু মনে হচ্ছে না বাংলাদেশের অভ্যন্তরেই বেড়ে ওঠা আরেকটি জনগোষ্ঠীর কথা। তাদের অবস্থা অনেকটা এই শরণার্থীদের মতোই। তারা বাংলাদেশের ভিতরে থেকেও দেশহীন-রাষ্ট্রহীন পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন যুগের পর যুগ।

এরা থাকেন বাংলাদেশের জেনেভা ক্যাম্প নামক মোহাম্মদপুরের ক্যাম্পে। ছোটবেলায় মোহাম্মদপুরে আত্মীয়-স্বজনদের বাসায় যাওয়ার সময় এই ক্যাম্পগুলো কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের কথা আর কখনো মনে হয়নি। কিন্তু এভাবে ভুলে থাকা কতটুকু সম্ভব? আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে সকল সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছি, পাসপোর্ট নিয়ে দেশ-বিদেশে যেতে পারছি, অথচ আমাদের পাশেই একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেও কোন প্রকার নাগরিকত্ব পাচ্ছেন না!

তাই মিয়ানমারের শরণার্থীদের নিয়ে বিবৃতি প্রচারের পর থেকেই আমরা সুযোগ খুঁজতে থাকি জেনেভা ক্যাম্পবাসীদের এমন একজনকে খুঁজে পাওয়ার যিনি তাদের না বলা কথাগুলো আমাদেরকে জানাবেন। আমরা বিভিন্ন জনকে এই ব্যাপারে ইমেইল দিয়েছি। এভাবে খুঁজতে খুঁজতেই আমরা পেয়ে যাই মি. খালিদ হোসেনকে। তিনি Council of Minorities নামে একটি এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা।

তার কাছেই আমরা জানতে পারি, জেনেভা ক্যাম্পবাসীরা আসলে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পেয়েছেন অনেক আগেই, কিন্তু তারপরও তাদেরকে নাকি পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে না। তারা কোন প্রকার নাগরিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না। বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া সত্বেও তারা পরিচিতি পাচ্ছেন 'আটকেপড়া পাকিস্তানি' হিসাবে।

তার সাথে কথা হওয়ার পর আমরা তাকে প্রস্তাব দেই তার একটি সাক্ষাৎকার নেয়ার। তিনি আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দেন। তবে সাক্ষাৎকার নেয়ার আগেই ঘটে যায় মিরপুরের কালশীতে এক নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় একটি পরিবারের কয়েকজন সদস্যকে। কালশীর এই ঘটনাটি মি. খালিদ হোসেনের সাক্ষাৎকার নেয়ার প্রয়োজনীয়তাটাকে আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

মি. খালিদ হোসেন আমাদেরকে জানিয়েছেন তার জনগোষ্ঠীর ইতিহাসের কথা, তাদের সংগ্রামের কথা। অকপটে স্বীকার করেছেন তারা কিছুদিন আগ পর্যন্তও নিজদেরকে পাকিস্তানি মনে করতেন। কিন্তু এক সময় এসে বুঝতে পারেন, তারা পাকিস্তানি নন। তারা বরং বাংলাদেশি।

তাদের এই অনুভূতি তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। মহামান্য আদালত তাদের সকল কথা শুনে রায় দেন, তারা যে ভাষায়ই কথা বলুন না কেন, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। তাদের পরিচয় হবে 'উর্দুভাষী বাংলাদেশি'। এটি ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি ঐতিহাসিক রায়।

এই রায়ের মাধ্যমে প্রমাণিত হল, বাংলাদেশ কোন একক জাতিগোষ্ঠী বা ধর্মাবলম্বীদের দেশ নয়। এই দেশে মুসলমানদের পাশাপাশি রয়েছে হিন্দুরা, বৌদ্ধরা এবং খৃষ্টানরা। বাংলাভাষী বাঙালিদের পাশাপাশি রয়েছে উর্দুভাষীরা, আদিবাসীরা। তাই বাংলাদেশ বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং বিভিন্ন ধর্মের জনগোষ্ঠীর একটি মিলন ক্ষেত্র। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা – যার যাই থাকুক না কেন, আমরা সবার মাঝে পরিচিতি পাব বাংলাদেশি হিসাবেই। বৈচিত্র্যের মাঝে এই মিলবন্ধনই আমাদের শক্তি।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি

এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার

মি. খালিদ হোসেনের জন্ম ১৯৮১ সালে ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে। ক্যাম্পে বসবাস করেই তিনি তারা পড়াশুনা শেষ করেন এবং এল,এল,বি পাশ করে ঢাকা বার কাউন্সিলে যুক্ত হন। বর্তমানে তিনি একজন এডভোকেট। তিনি কাজ করছেন উর্দুভাষী বাংলাদেশিদের নাগরিক অধিকার নিয়ে। ২০০৩ সালে উর্দুভাষী বাংলাদেশিদের নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। তিনি Council of Minorities (CoM) নামের একটি এনজিও'র প্রতিষ্ঠাতা এবং চিফ এক্সিকিউটিভ এবং Association of Urdu Speaking Bangladeshi (AUSB) নামক সংগঠনের প্রেসিডেন্ট। তার এই সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মাবরুর মাহমুদ। সাক্ষাৎকারটি নেয়া হয়েছে স্কাইপের মাধ্যমে।

আপনি আপনার প্রতিষ্ঠান কাউন্সিল অফ মাইনরিটিজের কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের কিছু বলুন।

আমরা কাউন্সিল অফ মাইনরিটিজের কার্যক্রম শুরু করি ২০১২ সালে। আমরা বহুদিন থেকেই বিহারীদের অধিকার নিয়ে কথা বলে আসছি বিভিন্নভাবে। কিন্তু সেই সময় আমরা চিন্তা করলাম যে, আমরা এতোদিন পর্যন্ত শুধুমাএ বিহারীদের অধিকার নিয়েই কথা বলেছি। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ক্ষেত্র বিহারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখি, তাহলে হয়তো আমাদের অধিকারগুলো আদায় করতে অনেক

বাধা আসতে পারে। তাই আমরা ঠিক করি, কাউন্সিল অফ মাইনরিটিজে আমরা বিহারীদের পাশাপাশি অন্যান্য সংখ্যালঘুদেরও কথা বলব, যাতে আমাদের অধিকারের বিষয়টাও সবার নজরে আসে।

২০১২ সালে কার্যক্রম শুরু করার পর ২০১৩ সালে আমরা একটা অনুদান পাই নামাতি নামের আমেরিকান একটি এনজিও থেকে। এর অফিস ওয়াশিংটন ডিসি'তে। তারা মূলতঃ লিগ্যাল এমপাওয়ারমেন্টের উপর কাজ করে। আমরা ২০১২ সালে ইউনেস্কোর একটি প্রোগ্রামে গিয়েছিলাম ইউএসএ' তে। সেখানেই আমার পরিচয় হয় তাদের সাথে।

আমরা ২০০৮ সালে হাইকোর্ট থেকে ভোটার লিস্টিংয়ের ব্যাপারে রায় পেয়েছি। এই রায়ে আদালত বলে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে যারা রয়েছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক এবং তাদেরকে আইডি কার্ডসহ ভোটার লিস্ট দিতে হবে। কোর্টের রায় অনুযায়ী আমরা এগুলো পেয়েছি। কিন্তু পাওয়ার পরও আমরা বিভিন্ন ক্যাম্পে দেখছি যে বিহারীদেরকে কিন্তু এখনো পাসপোর্ট দেয়া হয় না, ট্রেড লাইসেন্স দেয়া হয় না। এই বিষয়গুলি আমরা নামাতি ইন্টারন্যাশনালের সাথে আলোচনা করলাম। তারা বলল, তারা কাউন্সিল অব মাইনরিটিজকে একটি ফান্ডিং দেবে প্যারালিগ্যাল ইস্যুতে।

কাজটা হল যে আমরা ১০ জন প্যারালিগ্যালকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রস্তুত করব, এবং প্রশিক্ষণের সাহায্যে তারা ক্যাম্পে বসবাসকারী যে সকল উর্দুভাষীরা আছেন, তাদেরেকে সাহায্য করবেন। বর্তমানে আমরা এই প্যারালিগ্যাল প্রজেক্টের এক বছর শেষ করলাম। আমাদের ১০ জন প্যারালিগ্যাল আছে। আর আমাদের ৬টা প্যারালিগ্যাল সেন্টার আছে মোহাম্মদপুরে, মিরপুরে, চট্টগ্রামে একটা আছে, সৈয়দপুর, ময়মনসিং এবং খুলনাতে একটা করে সেন্টার আছে। আমাদের প্যারালিগ্যাল স্টাফরা ঐ সেন্টারগুলিতে গিয়ে বসে। তারা প্রতি মাসে দুই বার করে কমিউনিটি মিটিং করে, দলীয় সভা করে। তারা ক্যাম্পের জনগণকে বোঝায় আইডি কার্ড কি, কেন আইডি কার্ডের প্রয়োজন আছে। পাসপোর্ট কি, কিভাবে পাসপোর্ট পেতে পার। জন্ম সনদ কি, জন্ম সনদ কেন প্রয়োজন।

এরা যখন ক্যাম্পে গিয়ে এই কথাগুলো বলে, ক্যাম্পের অধিবাসীরা তখন এমপাওয়ারড হয়। তখন তারা আবার আমাদের সেন্টারগুলোতে এসে সাহায্য চায় যে কিভাবে আমরা এই সুবিধাগুলো পেতে পারি। প্যারালিগ্যালরা তাদেরকে ঐ সাহায্যটুকু করে দেয়। তাদেরকে ফর্ম পূরণ করে দেয়, তাদেরকে নিয়ে যায় সরকারি অফিসগুলোতে, এবং তাদেরকে সনদগুলো তুলতে সাহায্য করে। মূলতঃ এই কাজগুলো আমরা এখন করছি।

আপনি বলেছেন যে আপনি জেনেভা ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেছেন। এই জেনেভা ক্যাম্প বলতে আপনি কোন ক্যাম্প বোঝাচ্ছেন, এবং বর্তমানে বাংলাদেশে এই ধরনের কয়টি ক্যাম্প রয়েছে?

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর যখন দেশ স্বাধীন হয়ে গেল, তখন বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশ রেলওয়ের এটাচমেন্ট যেখানে ছিল, সেখানে কিন্তু উর্দুভাষীরা ছিল। ১৬ই ডিসেম্বরের পর লোকাল বাঙালিরা তাদের ঘরবাড়ি থেকে তাদেরকে বের করে দেয় এবং এক হিসাবে তারা তাদেরকে রিফিউজি বানিয়ে ফেলে। তারা কিন্তু কোনভাবেই রিফিউজি ছিল না।

১৯৭২ সালে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি ফর রেড ক্রস (আইসিআরসি) উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর তৎকালীন অবস্থানের আশেপাশে রিফিউজি ক্যাম্প বানিয়ে ঐ ক্যাম্পগুলিতে তাদেরকে দিয়ে দেয়। এটা ছিল কিন্তু সাময়িক একটা ব্যবস্থা। ঐ হিসাবে তখন ১১৬টি ক্যাম্প হয়েছিল এবং এখনো সারা বাংলাদেশে ১১৬টি ক্যাম্প আছে । আর প্রত্যেক ক্যাম্পের কিন্তু বিভিন্ন নাম আছে। যেখানে আমার জন্ম হয়েছে সেই জেনেভা ক্যাম্প হল ১১৬টি ক্যাম্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় ক্যাম্প কারণ এটি ঢাকাতে অবস্থিত। এভাবে কিন্তু ১১৬টি ক্যাম্পের বিভিন্ন নাম আছে।

এই নামগুলি কি রকম? আমরা যেমন জানি একটি ক্যাম্পের নাম জেনেভা ক্যাম্প। অন্য ক্যাম্পগুলির নাম কি?

হ্যা। এদের বিভিন্ন নাম আছে। যেমন মোহাম্মদপুরে আছে ৬টা ক্যাম্প। একটির নাম হল জেনেভা ক্যাম্প, একটা হল মার্কেট ক্যাম্প, একটা হল কমিউনিটি সেন্টার ক্যাম্প, টাউন হল ক্যাম্প, স্টাফ কোয়ার্টার ক্যাম্প, এবং সিআরও ক্যাম্প। ঢাকার বাইরে ময়মনসিংয়ে আছে পাটগুদাম ক্যাম্প। সৈয়দপুরে আছে রসুলপুর ক্যাম্প, চামড়াগুদাম ক্যাম্প। এভাবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে এই ক্যাম্পগুলি রয়েছে।

তাহলে ১৯৭১ সালের আগে এগুলোকে কি ক্যাম্প বলা হতো, নাকি এগুলো শুধু জনগোষ্ঠী হিসাবেই ছিল?

না। ১৯৭১ সালের আগে তো এই বিহারি কমিউনিটি খুবই প্রিভিলেজড কমিউনিটি ছিল। এরা রেলওয়েতে ছিল। তারা খুব ভাল টেকনিশিয়ান ছিল। এরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত ছিল। এরা যখন ইন্ডিয়া থেকে আসল, ঢাকাতে যে উন্নয়নগুলি হয়েছিল তৎকালীন সময়ে, সেই কাজগুলিতে কিন্তু এই বিহারীদের অবদান অনেক বেশি ছিল। সেটা কমলাপুর স্টেশনই বলেন, আর বায়তুল মোকাররম মসজিদই বলেন। তারা কিন্তু ভারত থেকে স্কিল নিয়ে আসল। তারা রেলওয়ের এক্সপার্টিজ নিয়ে আসল। তারা শিক্ষিত কিছু পেশাজীবী নিয়ে আসল।

আর এই কমিউনিটির মধ্যে যে একটা ভুল হল, সেটা হল ১৯৪৭ এর পর থেকে এই জনগোষ্ঠীর কেউই কিন্তু কোন প্রকার রাজনীতির সাথে জড়িত হল না। তখনকার কোন বিহারীকে কিন্তু আপনি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত দেখতে পাবেন না। বিহারীদের তখন কোন নেতা ছিল না। যার কারণে এদেরকে পাকিস্তান সরকার যেভাবে ইউজ করেছিল, পরবর্তীতে তারা কিন্তু মার খেয়েছ মূলতঃ তাদের নের্তৃত্বহীনতার কারণে। এরা ছিল টেকনিশিয়ান, একাডেমিশিয়ান, এরা ছিল পিডিবিতে, এরা ছিল রেলওয়েতে। এরা কিন্তু কখনোই কোন রাজনীতিতে যায়নি।

বর্তমানে আপনাদের জনগোষ্ঠীর মোট লোকসংখ্যা কেমন হবে?

এই বিষয়টাকে দুইভাবে দেখতে হবে। আমাদের কমিউনিটির কিন্তু দুইটি অংশ আছে। একটা অংশ হল যারা ক্যাম্পে থাকে, এবং আরেকটা অংশ হল যারা ক্যাম্পের বাইরে থাকে। ক্যাম্পের বাইরে যারা

থাকে, তারা কিন্তু ১৯৭১ সালের পর ক্যাম্পে কখনো ঢোকেনি। এদের অধিকাংশই ছিল শিক্ষিত। এই অংশটি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা যেখানে ছিল, তারা কিন্তু সেখানে থেকে গেল। তারা কিন্তু আইসিআরসি ক্যাম্পগুলিতে আর ঢোকেনি। তারা চিন্তা করল যে একবার যদি তারা এই ক্যাম্পগুলিতে ঢোকে, তাহলে তাদের কিন্তু এই ক্যাম্পগুলি থেকে বের হওয়া কঠিন হবে এবং তাদের সন্তানদের পড়াশুনার পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণে অনেক আগ থেকেই অনেক বিহারী কিন্তু ক্যাম্পে যায়নি।

সেই হিসাবে আমরা একটা সার্ভে করেছিলাম। সেই সার্ভেতে আমরা দেখেছি, ক্যাম্পের ভিতরে মোট জনগোষ্ঠী আছে প্রায় তিন লাখের মত। এবং একই রকম জনগোষ্ঠী রয়েছে প্রায় তিন লাখের মত ক্যাম্পের বাইরে। তাই আমরা বলতে পারি প্রায় ৬ লাখের মত বিহারী আছে সারা বাংলাদেশে। একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হল বাংলাদেশে বাংলা ভাষার পর উর্দু হল সেকেন্ড ভাষা যা প্রায় ৬ লাখের মত লোক ব্যবহার করে।

আমরা ইতিহাস থেকে যেমন জানি যে ১৯৭১ সালের পর বাংলাদেশের সরকার আপনাদের সম্প্রদায়কে দুটি অপশন দিয়েছিল, একটি হল বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করা অথবা পাকিস্তানের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে পাকিস্তানে চলে যাওয়া। এই ব্যাপারটি তখন কিভাবে ঘটেছিল?

এই বিষয়টা কিন্তু খুব সহজভাবে বুঝতে হবে। এটা কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের তরফ থেকে না। আমাদের যারা পূর্বপুরুষ ছিলেন, তারা কিন্তু কখনোই রিফিউজি ছিলেন না। তাদের সিটিজেনশীপ কিন্তু কখনো যায়নি। আপনি কিংবা অন্যান্য বাঙালি পরিবার যেমন ১৯৭১ সালের আগে পাকিস্তানি ছিল, এবং তার পরে বাংলাদেশি হয়েছে, একইভাবে আমাদের জনগোষ্ঠীরও কিন্তু একইভাবে আপনা আপনি সিটিজেনশীপ পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু এরা যখন ক্যাম্পে চলে আসল, তখন আইসিআরসি কিন্তু তাদেরকে একটি অপশন দিল। তারা বলল, তোমরা যেহেতু এখন ক্যাম্পে আছ, তাহলে তোমরা এখন কি করবে? তোমরা কি এই দেশে থেকে যাবে, নাকি তোমরা ভারতে ফিরে চলে যাবে, নাকি তোমরা পাকিস্তানে চলে যাবে?

তখন যে পরিস্থিতি ছিল, তখন কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে সারা বাংলাদেশে বিহারীদেরকে হত্যা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এর জ্বলন্ত প্রমাণ হল ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে খুলনাতে প্রায় ১০ হাজার বিহারীকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ঘটনাটি কিন্তু ঘটেছিল বাংলাদেশ সরকার থাকা অবস্থায়। এই দায় কিন্তু কোনভাবে কোনদিন বাংলাদেশ সরকার এড়িয়ে যেতে পারবে না। এই হত্যাকান্ডগুলি যখন ঘটছিল, তখন কিন্তু যারা ক্যাম্পের ভিতরে ছিল, তারা তখন জান এবং মালের ভয়ে বলল, না, আমরা ভারতেও ফিরব না, আমরা এই দেশেও থাকব না। আমরা বরং পাকিস্তানে

চলে যাব। এটা ছিল আনঅফিশিয়াল একটি অপশন। আইসিআরসি হল একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। তারা কিন্তু রাষ্ট্র না। সেটা ছিল আনঅফিশিয়াল।

তখন আইসিআরসি যখন দেখল এই ক্যাম্পগুলিতে যেহেতু প্রায় ৪-৫ লাখের মত জনগোষ্ঠী রয়েছে, তারা যেহেতু বলছে তারা পাকিস্তানে চলে যেতে চায়, তখন তারা পাকিস্তান সরকারের সাথে দেনদরবার শুরু করল। তারা বলল আপনাদের এতগুলো জনগোষ্ঠী, এরা উর্দুভাষী, এরা বিহারী, এরা আটকেপড়া পাকিস্তানি। আপনাদেরকে এদেরকে ফিরিয়ে নিতে হবে। কিভাবে নিবেন?

তখন কিন্তু পাকিস্তান সরকার বলল, এরা যে আটকে পড়া পাকিস্তানি, এর প্রমাণ কি?

তখন আইসিআরসি বলল, এরা তাহলে কারা? এদেরকে যে হত্যা করা হয়েছে, এরা যে উর্দু বলছে, এরা তাহলে কারা?

তখন পাকিস্তান সরকার বলল, হ্যা, তারা অবাঙালি ঠিক আছে, তারা মুসলমান ঠিক আছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, এখন যদি সাত কোটি বাঙালি দাবি করে তারাও পাকিস্তানি ছিল, এর মধ্যে যদি ৪ কোটি বাঙালি বলতে থাকে, হ্যা আমরাও পাকিস্তানি ছিলাম, এখন আমরা আটকা পড়ে গেছি, এবং আমরা পাকিস্তানে ফিরে যেতে চাই, তখন তাহলে কি বাঙালিদেরকেও পাকিস্তানে নিয়ে যেতে হবে? না, পাকিস্তান তাদেরকে নিতে পারে না।

তখন আইসিআরসি জোর দিল ইন্ডিয়ার সাথে এবং পাকিস্তানের সাথে। তখন ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ত্রিপক্ষীয় একটি চুক্তি করেছিল ১৯৭৪ সালে। সেই চুক্তিটি মূলত ছিল ইন্ডিয়াতে ৯০ হাজার আটকে পড়া পাকিস্তানি সৈন্যদের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য। আইসিআরসি তখন এই বিহারী ইস্যুটাকেও সেখানে প্লেস করল। এই চুক্তিটা হয়েছিল সিমলাতে।

সিমলাতে যখন বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তান চুক্তিটি সই করল, সেখানে পাকিস্তান সরকার বলল আমরা তিনটি ক্যাটাগরি করব। এই তিনটি ক্যাটাগরিতে যারা পড়বে, তারা হবে আটকেপড়া পাকিস্তানি। তারা উর্দুভাষী কিংবা বাংলাভাষী হোক না কেন, আমরা এই তিনটি ক্যাটাগরির মধ্যে যারা পড়বে তাদেরকে আমরা পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেব।

এই ক্যাটাগরিগুলি কি ছিল?

প্রথমে তারা বলল, ক্যাটাগরি ১ হল তারা যারা পশ্চিম পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেছিল, কিন্তু কোন কারণে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে আটকে পড়ে গিয়েছে, তারা হবে আটকেপড়া পাকিস্তানি।

ক্যাটাগরি ২ হল, যারা সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের কর্মচারী ছিল, তারা হবে আটকে পড়া পাকিস্তানি।

এবং ক্যাটাগরি ৩ হল, তারা ২৫ হাজার লোককে নিবে মানবিক কারণে যাদের মা-বাবা নেই, যাদের আত্মীয়-স্বজনকে হত্যা করা হয়েছে, তাদের মধ্য থেকে ২৫ হাজার লোককে নেয়া হবে।

এই তিনটি ক্যাটাগরির বাইরে যারা থাকবে, তারা হবে বাংলাদেশের নাগরিক এবং এদের দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের। এটি কিন্তু ১৯৭৪ সালে সিমলা চুক্তিতে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং বাংলাদেশ সরকারও এটা সই করেছিল।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার দেখতে পেরেছিল এই ক্যাম্পে যারা আছে, তাদের একজনও কিন্তু এই ক্যাটাগরিতে পড়েনা। তারপরও কিন্তু সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে আটকেপড়া পাকিস্তানি ইস্যুটিকে জিইয়ে রেখেছিল এবং তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল। যেহেতু এই চুক্তিটি হয়ে গিয়েছিল, আমরা কোর্টে গিয়েছি কিন্তু এই চুক্তিগুলো নিয়ে। যে কারণে কোর্ট কিন্তু আমাদেরকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর চেয়েও মজার বিষয় হল যে, দুইটি ক্যাটাগরি যারা পুরণ করেছে তারা পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল। তখন কিন্তু অনেক লোককে পাকিস্তান সরকার ফেরত নিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল তৃতীয় ক্যাটাগরী নিয়ে। এর আওতায় ২৫ হাজার লোকজনকে নেয়া হবে মানবিক কারণে। তখন তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার কি করল, এই ২৫ হাজার কোথা থেকে নিবে? তখন এই ক্যাম্প থেকে না নিয়ে বরং যারা প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ করেছিল, তাদেরকে যখন এরেস্ট করা হল, এবং সেন্ট্রাল জেলে রাখা হল, ঐ সেন্ট্রাল জেল থেকে সেই লোকগুলিকে নিয়ে এই ২৫ হাজারের মধ্যে পাঠিয়ে দেয়া হল। অথচ তাদের ট্রায়াল হওয়ার কথা ছিল। তাদের ট্রায়াল হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সরকার তখন এই দাগী লোকগুলোকে এই ২৫ হাজারের মধ্যে ফেলে দিয়ে দিল। আর ক্যাম্প থেকে কোন লোককে দিল না। অথচ ক্যাম্প থেকে লোক দেয়া হলে তখন অন্তত ২৫ হাজার লোক তাদের আশা পুরণ করতে পারত।

সেই সময় কি আপনাদের জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে কেউ কি বাংলাদেশি নাগরিকত্ব নিয়েছেন? এই ধরনের ঘটনা কি ঘটেছে?

না। তখন ক্যাম্পের ভিতরে যারা ছিল, তাদের কেউই কিন্তু তখন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নেয়ার কথা বলেনি। তাদের ১০০ ভাগই বলল যে তারা পাকিস্তানে চলে যাবে। আমি আগেও বলেছি একটি অংশ যারা ক্যাম্পের বাইরে ছিল, তারা কিন্তু কোন অপশন পায়নি। এখানে কিন্তু সমস্যাটা হল অপশন। যারাই অপশন পেয়েছে, যারাই ক্যাম্পে রয়ে গিয়েছিল, তাদের মধ্যেই কিন্তু সমস্যাটা হয়েছে।

যারা ক্যাম্পের বাইরে ছিল, তারা কিন্তু ১৯৭১ এর পর ভোট দিয়েছে, সেসময় পাসপোর্ট পেয়েছে, যদিও তারা ছিল উর্দুভাষী। তাদের সাথে দুটি বিষয় ছিল না। তারা ক্যাম্পের বাইরে ছিল এবং তারা অপশন পায়নি। অনেক বিহারী আছেন যেমন আল-ফালাহ বাংলাদেশের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর

আহমেদ ইলিয়াস, উর্দু কবি নওশাদ নুরী, এম আই ফারুকি, যিনি সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র লইয়ার – তারা কিন্তু ক্যাম্পে ঢোকেননি। ফলে তাদের সিটিজেনশীপ ওভাবেই ছিল। তারা আপনা আপনি ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ এখানে অপরাধটা হল ক্যাম্পে ঢোকা এবং অপশন দেয়া। এই অপশনটির কিন্তু আইনগত কোন মুল্য ছিল না।

আমরা জানি যে, স্বাধীনতার পর আটকেপড়া পাকিস্তানিদের পাঠানো হয়েছিল পাকিস্তানে। এই স্থানান্তরের মোট সংখ্যা কত এবং কোন কোন সময়ে এই স্থানান্তরটি হয়েছিল?

১৯৭৪ সালের ত্রিপক্ষীয় চুক্তির পর যখন একটি মতৈক্য হল যে এই তিনটি ক্যাটাগরির ব্যক্তিবর্গকে আমরা পাকিস্তানি বলব, তখন কিন্তু তাদেরকে নেয়া হয়েছে। অনেকে যারা সেন্ট্রাল গভর্মেন্টে কাজ করত, তাদেরকে নেয়া হয়েছে, এবং ২৫,০০০ ক্যাটাগরির ব্যক্তিদেরও পাঠানো হয়েছিল। এর সঠিক সংখ্যাটি কত, তা আমি বলতে পারছি না।

কিন্তু আরো মজার একটি বিষয় হল, সবকিছুর পর ১৯৯৩ সালে যখন আবার নওয়াজ শরীফ সরকার আসল, তখন নওয়াজ শরীফ সরকার ইমোশনালি চেয়েছিল যে করাচিতে যে উর্দুভাষী সম্প্রদায় রয়েছে এবং যে মোহাজেররা রয়েছে, তাদের ভোট ব্যাংক কাজে লাগানোর জন্য একটি ঘোষণা দিল যে, ঠিক আছে আমরা স্থানান্তরের যে ইস্যুটা আছে, তা আমরা শুরু করব। তারা কিন্তু ইমোশনালি বলেছিল। তারা ১৯৭৪ এর চুক্তি দেখেনি; তারা ওটাকে অগ্রাহ্য করে বলেছিল তারা মানবিক কারণে আরো কিছু লোককে পাকিস্তানে নিয়ে যাবে।

ঐ ১৯৯৩ সালের জানুয়ারি মাসে কিন্তু ৩২৩ পরিবারকে নেয়া হয়েছে। এই স্থানান্তরটা হয়েছে কিন্তু ১৯৭৪ এর চুক্তির বাইরে। এরা কিন্তু ঐ তিনটি ক্যাটাগরিতে পড়ে না। এরপরও নওয়াজ শরীফ সরকার ৩২৩ পরিবারকে নিয়েছিল। তার মধ্যে একটি পরিবার ছিল আমার শ্বশুরের। আমার স্ত্রীর বাবার পরিবার। তিনি ছিলেন সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের চাকুরে। তিনি পাকিস্তান সংবাদ সংস্থায় কাজ করতেন। কোন এক কারণে তার কাগজপত্রগুলো তখনো আসেনি। এই কাগজগুলো না আসার কারণে যখন এটা রিভিউ হল, যখন তারা বলল যে তারা ৩২৩ পরিবারকে নিয়ে যাবে, তখন আমার শ্বশুর আবেদন করলেন যে, আমি তো সেন্ট্রাল গভর্মেন্টের এমপ্লয়ী, সেহেতু আমি ১৯৭৪ সালের ঐ তিনটি ক্যাটাগরীর মধ্যে পড়ি। তখন পাকিস্তান সরকার শুধু সেই একটা পরিবারকে নিয়েছিল ১৯৭৪ সালের চুক্তি অনুযায়ী। আর বাকি ৩২২ পরিবার নেয়া হয়েছিল আদমজী নগর থেকে।

তার অর্থ কি এই যে ৩২৩ পরিবারকে নেয়া হয়েছিল ক্যাম্প থেকে?

হ্যা। ক্যাম্প থেকে। প্রথমবারের মত আদমজী ক্যাম্প থেকে এই ৩২২ পরিবারকে নেয়া হয়েছিল। জিয়াউল হক সরকার থাকার সময় কিন্তু আরেকটি চমৎকার বিষয় আছে যেটা হল, রাবেতা নামে একটা ট্রাস্ট করা হয়েছিল। এই ট্রাস্ট হয়েছিল পাকিস্তান এবং সৌদি সরকার মিলে। এর উদ্দেশ্য ছিল এই ট্রাস্টের টাকাগুলো দিয়ে এই বিহারীদেরকে প্রত্যাবাসন করা হবে। এটা কিন্তু জিয়াউল হক করেছিল। এই ট্রাস্টের বিশাল পরিমাণ টাকা কিন্তু এখনো পড়ে আছে। আমরা জেনেছি যে এই টাকাগুলো দিয়ে কিন্তু বিহারীদেরকে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু ঐ ট্রাস্টকে ৯/১১ এর পর ইউএস

সরকার ফ্রিজ করে রেখে দিয়েছে। তারা আশঙ্কা করেছিল এই টাকাগুলো হয়তো জঙ্গীবাদের পিছনে খরচ হবে।

এখন আমরা একটি প্রজেক্ট চালু করছি Research and Advocacy on Physical Rehabilitation of Camp-based Urdu Speaking Bangladeshis নামে। এই প্রকল্পে ঐ ট্রাস্টের কথাও আমরা রেখেছি। এর মাধ্যমে আমরা গবেষণা করব, কমিউনিটিকে মোবিলাইজ করব এবং সিরিজ ডায়লগ করব। ডায়লগের পর যে ফলাফল পাওয়া যাবে, সেগুলো নিয়ে আমরা এডভোকেসি করব সরকারের সাথে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে।

আমরা সেই রাবেতা ট্রাস্টের কথা এখানে আনছি কারণ আমরা চাচ্ছি যে ঐ ট্রাস্টে যদি টাকা থেকে থাকে, তাহলে এই টাকা এই উর্দুভাষীদের নামেই টাকা। তাহলে এই টাকা পাকিস্তানে কেন থাকবে? এই টাকাগুলো আমরা চাচ্ছি বাংলাদেশ সরকারকে দিতে হবে এবং বাংলাদেশ সরকার যেন এই টাকাগুলো দিয়ে বাংলাদেশেই আমাদের পুনর্বাসন করে দিতে পারে। আমরা এখন এটার উপরও কাজ করছি।

এই ৩২৩ পরিবারকে নেয়ার পর কি হল? এরপর কি বিষয়টি আবারো থেমে গেল?

এই ৩২৩ পরিবার নেয়ার পর কিন্তু পাকিস্তানের করাচিতে একটি বড় আন্দোলন শুরু হল। এই আন্দোলন ছিল সিন্ধিদের। তারা বলল, না, তাদেরকে পাকিস্তানে আনা যাবে না। তারা বলল, এরা পাকিস্তানে খাপ খাবে না। এদেরকে এখানে আনা ঠিক হবে না। এই আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এর চাপে কিন্তু নওয়াজ শরীফ সরকার আর কোন অগ্রগতি করল না। তারা আর নিতে আগ্রহী হল না। এদের বক্তব্য ছিল এই বিহারীরা যে যেখানে থাকবে, তারা অবশেষে পাকিস্তানের করাচিতে চলে আসবে। তখন এমকিউএম এর নেতা ছিলেন আলতাফ হোসেন; তিনি কিন্তু খুব জোরেশোরে পুরো করাচিকে একটি দখলের মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন।

সিন্ধিদের একটি ভয় ছিল যে এখন যে সকল বিহারী করাচিতে আছে, এমনিতে তো তারা খুব ভয়ানক অবস্থায় আছে। আর যদি আরো ৩ লাখ চলে আসে, তাহলে এদের সংখ্যা আরো বাড়বে। সে কারণে কিন্তু সিন্ধিরা চেয়েছিল কোনভাবেই যেন আর কোন বিহারী পাকিস্তানে আসতে না পারে। যার কারণে কিন্তু পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে পাকিস্তানি ভিসাটাও বন্ধ করে দিয়েছিল যেন কোন বিহারী ভিসা নিয়ে পাকিস্তানে আসতে না পারে।

অথচ বিনা প্রত্যাবাসনে কিন্তু আগে আমরা দেখেছি যে প্রতি সপ্তাহে শত শত লোক কিন্তু নিজেরা পাসপোর্ট করে টাকা পয়সা জোগাড় করে অনেকে কিন্তু পাকিস্তানে গিয়েছে। এমনকি পাকিস্তানের করাচি সিটিতে আওরঙ্গী টাউন নামে যে একটি টাউন আছে, ঐ টাউনের পুরো জনগোষ্ঠীই কিন্তু বাংলাদেশ থেকে গিয়েছে। বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে গিয়েছে। আমার পরিবার থেকেও গিয়েছে। আমাদেরও পরিকল্পনা ছিল। ২০০০ সাল পর্যন্ত কিন্তু বিহারীদের একটা আশা ছিল যে তারা পাকিস্তানে যেতে পারবে। বিভিন্ন ক্যাম্পে কিন্তু প্রতিটি পরিবারের কিছু না কিছু সদস্য পাকিস্তানে আছে। ২০০১ সাল পর্যন্ত কিন্তু আমরা সবাই চেষ্টা করেছিলাম কোনভাবে যদি আমরা পাসপোর্ট করে চলে যেতে পারি। আমার পরিবার থেকে আমার অর্ধেক পরিবার কিন্তু পাকিস্তানে আছে।

কিন্তু আমরা যখন বড় হলাম, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে আমরা শুধু যে নিজেদেরকে পাকিস্তানি পাকিস্তানি বলি, তখন ১৯৯৯, ঐ সময়ে আমরা কিন্তু তরুণরা একসাথে হয়ে ঠিক করলাম যে, আমরা আমাদের গোষ্ঠীর জন্য কিছু কাজ করব। ঐ করতে গিয়েই কিন্তু আমরা দেখলাম যে, না আমরা পাকিস্তানি না।

প্রথমবারের মত ২০০১ সালে আমরা হাইকোর্টে একটা রিট করলাম, এবং আমরা বললাম যে, আমরা বিহারী, আমরা জেনেভা ক্যাম্পে থাকি। আমরা এই ক্যাম্পে জন্মগ্রহণ করেছি। আর ভোটার লিস্টে আমাদের নাম নেই। কেন আমাদেরকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে না? ওটা কিন্তু ছিল একটি ঐতিহাসিক রায়।

কোর্ট তখন বলল, না, এরা তো বাংলাদেশের নাগরিক। তারা যেই ভাষায়ই কথা বলুক, জেনেভা ক্যাম্পসহ অন্যান্য ক্যাম্প বাংলাদেশের মধ্যে আছে। তাই এরা বাংলাদেশের নাগরিক। তখন কোর্ট আমাদের ১০ জনকেই কিন্তু ইন্সট্রাকশন দিয়েছিল যে এই ১০ জনকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আমরা মামলা করলাম ২০০১ সালে এবং রায় পেলাম ২০০৩ সালের ৫ই মে।

তখন কোর্টের রায় অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আমাদের ১০ জনকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করল। অন্তর্ভুক্ত করার পর আর বাকিদেরকে করছে না। তারা বলছে, আমাদের কাছে কোর্টের রায় আছে শুধু ১০ জনের ব্যাপারে। তাই আমরা তো সবাইকে করতে পারব না। তখন ২০০৮ সালে মিরপুর থেকে আরেকটি গ্রুপ ১১ জন মিলে আরো একটি মামলা করল। তারা বলল, এখন আইডি কার্ড দেয়া হচ্ছে। তাই বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা যারা আছি, তারা বাংলাদেশের নাগরিক। অতএব, সারা বাংলাদেশে আমাদেরকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং আইডি কার্ড দিতে হবে।

তখন কোর্ট কিন্তু ২০০৮ সালের ১৮ মে সাথে সাথে রায় দিল বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষী বাংলাদেশিদেরকে ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং তাদেরকে আইডি কার্ড দিতে হবে। তার সাথে কোর্ট আরো একটি বিষয় যুক্ত করল যে, যারা নিজেদেরকে এখনো পাকিস্তানি মনে করে, তারা যেন নিজেরাই এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এই বিষয়টা তাদের উপরেই ছেড়ে দেয়া হোক। ওখানেই কিন্তু আমাদের নামকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোর্টের রায়ের মাধ্যমে। কিন্তু যারা আইডি কার্ড নিতে চায়, এবং যারা নিজেদের নাম ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত করতে চায়, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই রায়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্পে প্রায় ৯০% জনগোষ্ঠী ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হল, এবং আইডি কার্ড পেল। ২০০৮ এ এই বিষয়টি একেবারে পরিষ্কার করে ফেলা হল এবং আমাদের আর কোন বাধা থাকল

না বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার ব্যাপারে অথবা ভোটার লিস্টে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে।

এখন আপনারা তো নাগরিকত্ব পেলেন, আইডি কার্ড পেলেন। তার মানে কি আপনাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল?

না। কিছুই হয়নি। মুলতঃ এখন বরং আমাদের কমিউনিটিতে আমাদেরকে লোকজন জিজ্ঞেস করে, তোমরা তো এই বিষয়ে পাইওনিয়ার, কিন্তু আমরা এর মাধ্যমে কি পেলাম? আমরা তো সিটিজেনস উইদাউট বেনেফিট। আমরা কিন্তু এতোদিন হয়ে যাওয়ার পরও পাসপোর্ট পাচ্ছি না। আমাদের প্যারালিগ্যালরা কিন্তু সারা বাংলাদেশেই কাজ করছে। দেখুন একটা দেশের মধ্যে কিভাবে দুইটি আইন চলতে পারে।

আমি যখন প্যারালিগ্যাল প্রজেক্ট চালাচ্ছি, এই প্যারালিগ্যালরা খুলনাতে, ময়মনসিংয়ে এবং সৈয়দপুরে প্রথমবারের মত ক্যাম্পের লোকজনকে ক্যাম্পের ঠিকানায় পাসপোর্ট করে দিয়েছে। এবং পাসপোর্টে লেখা আছে ক্যাম্পের নাম এবং অবস্থান, যেমন ৫ নং ক্যাম্প, খালিশপুর, খুলনা। বিহারী পাটগুদাম ক্যাম্প, ময়মনসিং।

অথচ ঢাকাতে এবং চট্টগ্রামে যখন আমাদের প্যারালিগ্যালরা আরো ৫টি কেস হ্যান্ডল করল, তখন ৫টি কেসকেই প্রত্যাখ্যান করল পুলিশ। স্পেশাল ব্রাঞ্চ অফিস বলল যে, না আপনাদেরকে পাসপোর্ট দেয়া হবে না। আমাদের কাছে আদেশ আছে যে বিহারী এবং রোহিঙ্গাকে কোনভাবে পাসপোর্ট বা সিটিজেনশীপ ডকুমেন্ট দেয়া যাবে না।

তখন আমাদের প্যারালিগ্যালরা তাদের সাথে তর্ক করল। আপনারা কাকে বলছেন রোহিঙ্গা, এবং কাকে বলছেন বিহারী। রোহিঙ্গা হল রিফিউজি এবং বিহারী হল বাংলাদেশের নাগরিক। তারা বলল, না আমাদের কাছে আদেশ আছে। আমরা চাইলাম যে আপনাদের কাছে যে আদেশ আছে তার কপিটি আমাদেরকে দিন। আমাদেরকে সেটাও দেয়া হল না। এই আদেশ কে দিয়েছে, কেন দিয়েছে, এতে কি লেখা আছে, তা কেউ জানে না। এটা অবৈধ একটি আদেশ।

আমরা বলছি, আমাদের ক্লায়েন্টদের কাছে আইডি কার্ড আছে। আমার মক্কেল বাংলাদেশের নাগরিক। আর পাসপোর্ট পাওয়ার যে দুটি শর্ত আছে, আইডি কার্ড এবং জন্ম সনদ, তার দুটোই আছে আমাদের মক্কেলদের কাছে। তাহলে আপনারা কেন দিচ্ছেন না তাকে? তারা এই বলে বিষয়টা এড়িয়ে গেল যে আমাদের কাছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আদেশ আছে। যাক গে। আমরা খুব তর্ক করলাম, কিন্তু আমরা পাইনি। এই ৫ জন ক্লায়েন্টের কেসটা কিন্তু এখনো প্রত্যাখ্যাত হয়ে আছে।

এরপর আমরা আমার নিজের নামে বিগত মে মাসের ২২ তারিখে একটি রাইট টু ইনফরমেশন পিটিশন দিলাম এবং এই পিটিশনে আমি লিখলাম যে বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্যাম্পে বসবাসকারী উর্দুভাষীরা কেন পাসপোর্ট পাচ্ছে না? এই পাসপোর্ট পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন নীতিমালা আছে কিনা? আমরা তা জানতে চাই। এই পিটিশনের সময়সীমা হল ২১ দিন। ২১ দিনের মধ্যে কিন্তু যে কোন মন্ত্রণালয় এই রাইট টু ইনফরমেশনের তথ্য দিতে বাধ্য। কিন্তু আমাকে এখনো তা দেয়া হয়নি।

আমি আবার এই মাসে একটি রিভাইজড পিটিশন দিলাম এবং দিয়ে বসে আছি। ইতোমধ্যেই আমি আমার যে দাতাগোষ্ঠী আছে নামাতি, তাদের সাথে আলাপ করলাম। তারা বলল তোমরা ব্লাস্টের সাথে আলাপ কর। তারা যেহেতু লিগ্যাল এইড নিয়ে কাজ করে। দেখ তারা তোমাদেরকে কি সাপোর্ট দিতে পারে।

আমরা ব্লাস্টের সাথে আলাপ করলাম। ব্যারিস্টার সারা হোসেন স্বেচ্ছায় এটি হ্যান্ডল করলেন। বললেন আমরা একটি রীটের মাধ্যমে এটিকে হাইকোর্টে মুভ করব। আমরা ইতোমধ্যে গত সপ্তাহে ২২ জন ক্লায়েন্টের নামে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়ে দিয়েছি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে, পাসপোর্ট অথরিটিকে, এবং আইন মন্ত্রণালয়কে। আমরা বলেছি কেন আমাদের ক্লায়েন্টদেরকে পাসপোর্ট দেয়া হচ্ছে না, কারণ দর্শাতে। যদি না হয় তাহলে আমরা আগামী সপ্তাহে বা আগামী দশদিনের মধ্যে হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন ফাইল করব।

আপনাদের যে অংশটি পাকিস্তানে চলে গেছে, তাদের সাথে কি আপনাদের যোগাযোগ আছে?

জ্বি। অবশ্যই আছে। যেহেতু আমি বলেছি আমাদের ক্যাম্পে বিভিন্ন পরিবার থেকে কিছু না কিছু লোকজন পাকিস্তানে আছে। আগে তারা টেলিফোনে আলাপ করতেন। এখন মোবাইল চলে আসাতে এবং ইন্টারনেটের কারণে স্কাইপে সবার সাথে প্রতিদিনই যোগাযোগ রয়েছে।

তাদের পরিস্থিতি এখন কেমন?

ওদের অবস্থা কিন্তু আরো করুণ। ভালো নয়। তাদের অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। কোন অর্থে খারাপ? যেহেতু তারা পাসপোর্ট করে গিয়েছিল এবং ওখানে গিয়ে পাসপোর্ট ফেলে দিয়েছে। এবং কোনভাবে তারা ওখানে কাজকর্ম করছে। কিন্তু ওখানকার সরকার জানে যে এরা বাংলাদেশ থেকে আসা এবং ক্যাম্প থেকে আসা লোকজন। আর পাকিস্তান আপনি জানেন যে সেখানে দুর্নীতি খুবই ব্যাপক। ওখানে আইডি কার্ড, পাসপোর্ট এগুলো পাওয়া খুবই সহজ। টাকা দিলেই হয়ে যায়।

ওদের ক্ষেত্রে যেটা হয়, আইনতঃ তারা কিন্তু ওখানে রিকগনাইজড না। ওখানে যদি কোন বিহারীকে আইডি কার্ড করতে হয়, যেখানে একজন পাকিস্তানি নাগরিককে করতে হয় ৫০০ টাকা দিয়ে, সেখানে একজন বিহারীকে ৫০০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়। একটা পাসপোর্ট করতে যেখানে ৩০০০ টাকা খরচ হয়, সেখানে তাদেরকে ১৫,০০০ টাকা দিতে হয়। এবং যখন তারা রিনিউ করতে যায়, এটা খুব বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা যে, তাদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করে ১৯৭১ এর আগে তোমরা যে এখানে ছিলে,

তার প্রমাণ তোমরা দেখাও। তোমার বাবা কোথা থেকে এসেছিল এবং তোমার দাদা কোথা থেকে এসেছিল। তারা জানে যে এরা তো ১৯৭১ এর পরে এসেছে। তখন কিন্তু তারা তাদের কাছে জিম্মি। ওরা খুবই নিকৃষ্ট অবস্থায় আছে।

আর তাদের রাজনৈতিক অবস্থান খুবই খারাপ। এমনকি আমরা দেখেছি ৫-৭টা পরিবার বাংলাদেশ থেকে ওখানে গিয়েছে সব উজাড় করে, আবার ওখান থেকে সব উজাড় করে বাংলাদেশে ফিরে এসেছে। এখনো কিন্তু অনেকে বাংলাদেশে ফিরে আসতে চাচ্ছে। ওখানে সকালে গেলেই যে রাত্রে ফিরবে, তার কিন্তু কোন নিশ্চয়তা নাই।

এমনকি আগে যে বাংলাদেশের ১ টাকা পাকিস্তানে গিয়ে ৫০ পয়সা হয়ে যেত, কিন্তু এখন বাংলাদেশের ১০০ টাকা কিন্তু পাকিস্তানে গিয়ে ১৪০ টাকা হয়ে যাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিকভাবেও কিন্তু তারা খুব মার খেয়েছে। ওখানে দ্রব্যমূল্য খুব বেশি। তারা খুব একটা চাকরি-বাকরিতে ঢুকতে পারছে না ওভাবে। তার উপরে আছে আইনি ঝামেলা। রাজনৈতিক অস্থিরতা আছে। সে কারণে কিন্তু অনেকেই চেষ্টা করছে কোনভাবে যদি আবার বাংলাদেশে ফিরে আসা যায়।

এই সম্প্রদায়ের অবস্থা দেখে আমার যে অনুভূতি হচ্ছে, আমার কেন জানি মনে হয় এই সম্প্রদায়ের উপর কোন অভিশাপ আছে। তাদের মধ্যে এতো মাইগ্রেশন। ইন্ডিয়া থেকে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে আবার বাংলাদেশ, আবার বাংলাদেশ থেকে আবার পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে আবার বাংলাদেশ; আবার পাকিস্তান থেকে কেউ দুবাই যাচ্ছে, কেউ ইউরোপে চলে যাচ্ছে, আমেরিকাতে চলে যাচ্ছে। এই কমিউনিটিতে কখন যে এই মাইগ্রেশন শেষ হবে, কোন দেশে গিয়ে যে তাদের মাইগ্রেশন শেষ হবে, কেউ কিন্তু কিছু বলতে পারছে না এখনো।

বর্তমানে কয়টি এনজিও কাজ করছে আপনাদের কমিউনিটিতে?

খুবই কম। আসলে এনজিও কার্যক্রম বলতে গেলে নেই। এখানে খুব বৈষম্য হচ্ছে। আপনি দেখেন বাংলাদেশে কিন্তু অনেক বড় বড় এনজিও আছে। এদের কিন্তু কোন ইচ্ছা নেই যে এই কমিউনিটির অধিকার নিয়ে বলার। এরা কিন্তু কাজ করছে না। তাদের মনে এখনো আছে। এমনকি রায় হওয়ার পরও কিন্তু এখনো বলা হয় এরা যুদ্ধাপরাধী, এরা যুদ্ধাপরাধ করেছিল। কেন এদের জন্য আমরা কাজ করব? এই যে স্টিগমাগুলো, এগুলো কিন্তু অনেক খারাপ প্রভাব বিস্তার করছে।

বর্তমান সরকার যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি নিয়ে যেভাবে কাজ শুরু করেছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কমিউনিটিও কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। প্রতিটি রায়েই চলে আসছে, সেটা কাদের মোল্লা হোক, কিংবা সাইদী হোক, বা যাই হোক, তাদের সাথে বলা হচ্ছে বিহারী এবং রাজকারদেরকে মিলিয়ে।

কিন্তু আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে, বিহারী এবং রাজাকার মিলিয়ে তো বলা হচ্ছে, কিন্তু আসলে বিহারী কতজন দোষী ছিল; আর ৭১ এর পরবর্তী প্রজন্মেরও বা কি দোষ? আমাদের বক্তব্য হল যদি কোন বিহারীকে আইডেন্টিফাই করা হয়, তাদেরকে তাহলে ট্রায়ালে আন। কিন্তু এভাবে পুরো বিহারী গোষ্ঠীকে যুদ্ধাপরাধী বলে তাদেরকে শাস্তি দেয়া যাবে না।

তো এই কাজগুলো কে করবে? এখন মেইনস্ট্রিমের লোকজন যদি এই ব্যাপারে কথা না বলে, তাহলে কিন্তু আমাদের খুবই মুশকিল হয়ে যাবে। আপনি যেটা বলেছেন যে কারা কাজ করছে? কাজ করছে আল-ফালাহ বাংলাদেশ নামের একটি এনজিও যারা শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করছে। নতুন করে শুরু করেছে OBATHELPERS, ইউএসএ'র একটি সংস্থা। তারা কাজ করছে স্কুল, স্বাস্থ্য নিয়ে এবং কিছু ঋণ কার্যক্রম তারা নিয়ে এসেছে।

আমার সংগঠন যেটা আছে Council of Minorities; আমরা কাজ করছি আইন বিষয়ে এবং মানবাধিকার বিষয়গুলো নিয়ে। মুলত এই ৩-৪টি সংস্থাই এখন কাজ করছে। Award নামের একটি প্রতিষ্ঠান আছে যারা মুলতঃ ক্যাম্পের বাইরে থাকেন। তারা ৪-৫ জন মিলে একটি চ্যারিটি প্রোগ্রাম করেন; প্রতি সপ্তাহে তারা একটি জায়গায় বসেন ক্যাম্পের ভিতরে, সেখানে তারা কিছু সম্ভাবনাময় স্টুডেন্টদেরকে বৃত্তি দেন। আর কিছু খাদ্যদ্রব্য দেন। স্বাস্থ্য বিষয়েও তারা সাহায্য করেন। তাই মুলতঃ ৪-৫ টার মতো এনজিও আছে শিক্ষা এবং লিগ্যাল ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন। লিগ্যাল ইস্যুতে আমরাই মুলত কাজ করছি।

আপনারা আপনাদের বক্তব্যগুলো কখনো প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে বলেছেন?

অবশ্যই। আমাদের দুঃখ হল মিডিয়াকে নিয়ে। আমরা মিডিয়াকে হাজারোবার, লক্ষবার বলেছি, আমরা আটকেপড়া পাকিস্তানি না। আমরা উর্দুভাষী বাংলাদেশি। আমরা যদি কোন প্রোগ্রাম করি, মিডিয়া আমাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কোনভাবেই কিন্তু আমাদের প্রোগ্রামগুলো হাইলাইট হয় না। আর যদিও হয়ে থাকে, তাহলে হেডিং চলে আসে আটকেপড়া পাকিস্তানিদের এই প্রোগ্রাম। আটকেপড়া পাকিস্তানিদের এই সমস্যা। আটকেপড়া পাকিস্তানিদের ওই সমস্যা। যেখানে কোর্ট স্পষ্ট বলে দিয়েছে, এরা উর্দুভাষী বাংলাদেশি। তারপরও কিন্তু মিডিয়া এই বিষয়টাকে কেন যে হাইলাইট করছে, কেন যে এই বিষয়টাকে টিকিয়ে রাখছে! এটাও কিন্তু একটা রাজনীতি।

কিভাবে এই আটকে পড়া পাকিস্তানিদেরকে এই নামে বলে বলে বিষয়টা টিকিয়ে রাখা যায়; এই নামে বললেই কিন্তু বাংলাদেশের দায়-দায়িত্ব চলে যায়। যার কারণে মিডিয়াও কিন্তু কাজগুলো করে। মিডিয়া থেকে আমরা একদম নাজেহাল অবস্থায় আছি। মিডিয়াকে আমরা কোনভাবেই প্রভাবিত করতে পারিনি এবং মিডিয়াও কিন্তু কোনভাবেই আমাদের ইস্যুতে ওভাবে যতোটা না হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যাপারে হাইলাইট দেয়, যতোটা না আদিবাসীদের কথা আসে, আপনি দেখেন এই যে গত জুন মাসে যে ঘটনাটি হল কালশীতে, প্রথমবার বাংলাদেশে উর্দুভাষীদের ইস্যুটা মিডিয়াতে এতোবার আসছে, অথচ চল্লিশ বছরেও কখনো কিন্তু এতো ভালভাবে মিডিয়াতে এভাবে সাড়া পায়নি।

আপনি দেখেন বিগত তিন বছরে কিন্তু উর্দুভাষীদের কোন ইস্যু আপনি মিডিয়াতে খুঁজে পাবেন না। কিন্তু বিগত তিন মাসে প্রতিটি মিডিয়াতে আপনি আদিবাসীদের খবর পাবেন। প্রতিটি মিডিয়াতে দলিতদের খবর পাবেন। প্রত্যেক মিডিয়াতে হিন্দুদের খবর পাবেন। কিন্তু উর্দুভাষী মুসলিম সংখ্যালঘু যারা আছে, তাদের কথাগুলো কিন্তু আসে না। ইচ্ছাকৃতভাবে এরা পাশ কাটিয়ে যায়।

আপনি কথা বলে দেখেন, অনেক বুদ্ধিজীবী যারা আছেন, তারা বলবেন এদের তো এখানে থাকার কোন যোগ্যতাই নাই। এরা যাই থাকুক, এরা তো ঐ বংশেরই লোক। এরা তো যুদ্ধাপরাধী। এদেরকে তো বের হতেই হবে। নিজেদেরকে প্রগতিবাদী বলে লোকজন। কিন্তু তাদের মধ্যে এইটুকু ঘৃণা আছে। তারা বলে এদেরকে তো আগেই হত্যা করা উচিত ছিল। কোন সেন্সে তারা এই কথাগুলো বলে?

কালশীর ঘটনার পর মিডিয়া কিংবা সিভিল সোসাইটির দৃষ্টিভঙ্গি কি আপনাদের প্রতি বদলাচ্ছে? এই ধরনের কোন ইঙ্গিত কি আপনারা পেয়েছেন?

হ্যা। এটা এবার পেয়েছি। রিয়েলি এবার পেয়েছি। আমরা দেখেছি, সিভিল সোসাইটির এমন এমন লোকজন দেখেছি যারা নিজেরাই ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়েছে প্রেস ক্লাবের সামনে এবং তারা মানববন্ধন করেছেন, তারা সিমপ্যাথি দেখিয়েছেন। অনেক সাড়া পেয়েছি আমরা। খুব ভাল একটা সাড়া পেয়েছি। যার কারণেই কিন্তু আমার সাহস হয়েছে রিসার্চ এবং ফিজিক্যাল রিহেবিলিটেশন নামে যে প্রজেক্ট আমি এখন ড্রাফট করছি, যা নিয়ে আমি আগামী এক বছর কাজ করব। মিডিয়াতে সিভিল সোসাইটির লোকজন কিন্তু খুব ভাল একটা সাপোর্ট দিয়েছে আমাদেরকে।

এখন আমরা আপনাদের পুনর্বাসন পরিকল্পনা নিয়ে কিছু কথা বলব। আমার খেয়াল হচ্ছে আজ থেকে প্রায় বছরখানেক আগে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে জেনেভা ক্যাম্পবাসীদের জন্য কিছু বহুতল এপার্টমেন্ট প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল। সেই প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কিংবা কোন অগ্রগতি হয়েছে কিনা, এই সম্পর্কে কিছু বলবেন?

জ্বি। এটা ছিল ২০১০ সালে; সেসময় মালয়শিয়ান সরকার ১২০০ কোটি টাকা দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকারকে। এবং এই ১২০০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে গেজেট হয়েছিল এবং আমরা গেজেটে

দেখেছি, ১২০০ টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল মোহাম্মদপুর জেনেভা ক্যাম্পসহ ৬টি ক্যাম্পকে পুনর্বাসন করা হবে। এই ৬টি ক্যাম্পকে ২টি ক্যাম্পের মধ্যে আনা হবে। ৪৫টি বিল্ডিং হবে। এবং প্রতিটি ১৫ তলা ভবন হবে।

এটা মুলতঃ ছিল একটি ফেক প্ল্যান। পুরোপুরি ফেক একটা প্রজেক্ট। যেখানে এই কমিউনিটির লোকজন রিক্সাচালক, বারবার, হ্যান্ডিক্রাফটস ওয়ার্কার, তাদেরকে কিভাবে ১৫ তলা বিল্ডিংয়ে আপনি পুনর্বাসন করবেন? ঐ বিল্ডিংয়ে যে ইউটিলিটি বিল আসবে, তার খরচ কে দিবে? এটা আনপ্ল্যানড একটা প্রকল্প ছিল। ১২০০ কোটি টাকাকে আত্মসাৎ করার একটি পরিকল্পনা ছিল।

তো সরকার সেটা করেছিল এবং পরবর্তিতে সেটা ফেলও হয়েছে। তারপর কিন্তু ১২০০ কোটি টাকা বাজেট হয়েছে, ঐ টাকাগুলো কোথায় গিয়েছে, কেউ কিন্তু কোন সুরাহা দিতে পারবে না। ওটা নিয়ে সরকার আর কোন কিছু বলেনি। তারপর থেকে পুনর্বাসনের কোন কথাও হয়নি।

আমরা বলতে চাই, পুনর্বাসন আপনি করবেন কাদের? এই ক্যাম্পে যারা আছে প্রথমে তাদেরকে ইনভলভড করতে হবে। জানতে হবে তারা কি চায়। তারা কিভাবে পুনর্বাসিত হতে চায়। কারণ আমরা শুধু মোহাম্মদপুর নিয়ে তো পুনর্বাসনের কথা বলছি না। আমরা বলছি সারা বাংলাদেশের ক্যাম্পগুলোর কথা। আমরা এই সকল ক্যাম্পগুলোকে শেষ করতে চাই। ক্যাম্পগুলো যতোদিন টিকে থাকবে, ততোদিন এই কমিউনিটির অবস্থার পরিবর্তন হবে না। তারা কিন্তু শুধু অনুদান এবং চ্যারিটির উপরই থাকবে। এরা কিন্তু কখনো বের হয়ে চিন্তা করতে পারবে না। এই কমিউনিটি একটি সম্পদে পরিণত হতে পারে যদি এদেরকে সঠিকভাবে পুনর্বাসন করা যায়। কিন্তু যদি ওভাবে ক্যাম্পে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়, তাহলে কিন্তু এই কমিউনিটি বিশাল একটি বোঝায় পরিণত হবে।

আপনি দেখেন, আমরা উর্দুতে কথা বলতে পারি, আমরা হিন্দিতে কথা বলতে পারি। আমরা ইংরেজি পারি। আমরা বাংলা পারি। আমরা মাল্টিলিঙ্গুয়াল কমিউনিটি। যদি আমাদেরকে এভাবে আরো প্রান্তিক করে দেয়া হয়, তাহলে আমি বলব, এই কমিউনিটির কোন একটি শ্রেণি কিন্তু আগামীতে গিয়ে সামাজিক বোঝায় পরিণত হতে পারে। কোন ঠিক নাই তারা কিন্তু অবৈধ কোন কর্মকান্ডে ব্যবহৃত হতে পারে। যেহেতু এরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে পারে। এদেরকে এখান থেকে প্রশিক্ষণ দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু অসামাজিক কাজগুলোতে ব্যবহার করা হতে পারে। এই ধরনের সম্ভাবনা আছে।

যার কারণে আমরা কিন্তু বলছি, এই সম্ভবনাটুকু হওয়ার আগেই কিন্তু এদেরকে পুনর্বাসন করতে হবে এবং এদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। না হলে এই দায়ভার কারা নিবে? আপনি যদি বিহারী কোন তরুণকে কোন সুযোগ না দেন, তাহলে সে কিন্তু পড়াশুনা করতে পারবে না। সে পড়াশুনা করে

যদি চাকরি না পায়, সে যদি হতাশ হয়ে যায়, তাহলে সে কি করবে? সে কিন্তু তখন ভুল পথে যাবেই। আর ভুল পথে যদি একবার চলে যায়, তাহলে কিন্তু ওদেরকে ফিরিয়ে আনা কঠিন হবে।

এই সমস্যা কিন্তু মোকাবেলা করতে হবে গোটা উপমহাদেশকেই। কারণ এরা এই উপমহাদেশের যে কোন দেশে গিয়েই কিন্তু সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। কারণ তারা হিন্দি পারে, উর্দু পারে, বাংলা পারে। এই প্রবণতা থেকে এদেরকে রক্ষা করার জন্য বাংলাদেশের সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এদেরকে আগেই মেইনস্ট্রিমে আনতে হবে। এদের উপর বৈষম্য কমাতে হবে। এই বৈষম্য যদি দুর করা না হয়, তাহলে কিন্তু এরা বিপদ বয়ে আনতে পারে।

তো পুনর্বাসনের কথা আমরা বলছি। পুনর্বাসন অবশ্যই হতে হবে। তবে এই পরিকল্পনার সাথে আমাদেরকে যুক্ত করতে হবে। একটি পরিকল্পনা করতে হবে। একটি ট্রাস্ট গঠন করতে হবে পুনর্বাসনের জন্য। এবং আমাদের সাথে বসতে হবে, ঠিক করতে হবে কাদেরকে পুনর্বাসন করা হবে। তাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে হবে। জীবনযাত্রার বিষয়টি খুব গুরুত্বপুর্ণ। পুনর্বাসিত হওয়ার পর সে যদি শান্তিতে কাজ করতে না পারে, তাহলে এই কমিউনিটি কিন্তু কখনো দাঁড়াতে পারবে না।

আমাদের যে প্রজেক্টটা হচ্ছে, সেখানে কিন্তু তিনটি কাজই হচ্ছে। প্রথম হল যে আমরা গবেষণা করব, আমরা জানব আমরা কি চাই, পুনর্বাসন বলতে আমরা কি বুঝি। তারপর আমরা কমিউনিটি মোবিলাইজ করব। সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে। আমরা প্রত্যেক ক্যাম্পে কমিটি বেজড অর্গানাইজেশন গঠন করব যারা চিন্তা করবে পুনর্বাসন নিয়ে। আমাদের এই কার্যক্রম থেকে যে ফলাফলগুলো আসবে সেই ফলাফল নিয়ে আমরা এডভোকেসি করব। তাই এখানে মুলতঃ তিনটি পার্ট থাকবেঃ রিসার্চ, কমিউনিটি মোবিলাজেশন, এবং এডভোকেসি।

এডভোকেসির মধ্যে আবার আমরা কমিউনিটির লোকজন এবং এক্সপার্টদেরকে অন্তর্ভুক্ত করব। তারপর আমরা সরকারের সাথে এডভোকেসি করব। আমরা কমউিনিটির কাছ থেকে তথ্যগুলো নিয়ে সরকারের সাথে বসব। আমরা বলব আমরা এইভাবে পুনর্বাসিত হতে চাই। এখানে ফান্ডিং কিভাবে হবে, তা নিয়ে কথা হবে। এই ফান্ডিং কিভাবে ব্যবহার করা হবে, তা নিয়ে কথা হবে। মুলতঃ এই তিনটি কার্যক্রমকে সামনে রেখে আমরা এগুচ্ছি।

আমাদেরকে এই মুল্যবান সাক্ষাৎকার দেয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

আপনাকেও ধন্যবাদ।

মি. খালিদ হোসেনের ইমেইলঃ khalid.aygusc@gmail.com

ওয়ার্ড প্রসেসিং এবং কভার ডিজাইনঃ মাবরুর মাহমুদ
ছবিসুত্রঃ UN Photo

আইএফডি পরিচিতি

IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD) একটি ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংক (Virtual Think Tank)। এর মূল ধারণার প্রকাশ ঘটে ২০০৭ সালের জানুয়ারী ১৮ তারিখে একটি ইমেইলের মাধ্যমে। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির কোন অফিস নেই। এর ওয়েব এবং ইমেইল এড্রেসই এর ঠিকানা। এই থিঙ্ক ট্যাংকটির উদ্যোক্তা সৌদি আরব প্রবাসী মি. মাবরুর মাহমুদ। তিনি একজন বাংলাদেশি নাগরিক। আইএফডি তারই চিন্তার ফসল।

এই ভারচুয়্যাল থিঙ্ক ট্যাংকটির মূল উদ্দেশ্য ইন্টারনেটের শক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আইডিয়ার আদান প্রদানের মাধ্যমে দেশ, জাতি এবং সর্বোপরী মানবতার সার্বিক উন্নয়ন সাধন করা। এটাই এই থিঙ্ক ট্যাংকটির মিশন স্টেটমেন্ট।

এই মিশন স্টেটমেন্ট প্রতিফলিত হয়েছে এই থিঙ্ক ট্যাংকটির লোগোতেও। এর লোগোতে চার রঙের ব্লক ব্যবহার করা হয়েছে। এই চারটি রঙের মাধ্যমে বিশ্বের চারটি জাতি বা রেসকে (Race) বোঝানো হয়েছে। আইএফডি বিশ্বাস করে বর্তমান বিশ্বে যে অস্থিরতা এবং অশান্তি রয়েছে, তার মূলে রয়েছে জাতিগত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য। তাই আমরা বিশ্বাস করি এই নানাবিধ বৈষম্য যদি দুর করা যায়, তাহলে বিশ্বে অস্থিরতা অনেক কমে আসবে।

কিন্তু বৈষম্য কমানোর জন্য চাই নতুন নতুন উন্নয়ন আইডিয়া। বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর জাতিগুলি বিভিন্ন গবেষণার মাধ্যমে নিত্যনতুন উন্নয়ন আইডিয়া তৈরি করছে এবং তার সফল বাস্তবায়ন করে দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু স্বল্পন্নোত দেশগুলি সম্পদ কম থাকার কারণে বা সম্পদের যথেচ্ছ অপব্যবহারের কারণে এই প্রতিযোগিতায় দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। ফলে উন্নত এবং উন্নয়নকামী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান বাড়ছে এবং বৃদ্ধি পাচ্ছে দারিদ্র্য এবং শোষণ।

বিভিন্ন আইডিয়া উদ্ভাবনের মাধ্যমে জাতিগত এই ব্যবধান কমানোর একটি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই আইএফডির সৃষ্টি। আইএফডি বিশ্বের সকল চিন্তাশীল এবং উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী মানুষদের আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হতে চায়। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে চিন্তাশীল মানুষরা তাদের আইডিয়ার আদান প্রদান করবেন, এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আইএফডির মাধ্যমে আইডিয়া আদান প্রদান করলে একজন উদ্ভাবক বেশ কয়েকটি সুবিধা পাবেন।

প্রথমত, উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য আইডিয়া তৈরি করাই শেষ কাজ নয়, বরং এটি পুরো প্রক্রিয়াটির শুরু মাত্র। একজন উদ্ভাবককে শুধু আইডিয়া তৈরি করলেই চলবে না, বরং একটি সমস্যার চুলচেরা বিশ্লেষনের মাধমে তার নতুন আইডিয়াটি দিয়ে সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যাবে তা উপস্থাপন করতে হবে একটি মডেলের আকারে। সেই মডেল আবার বাস্তবায়নযোগ্যও হতে হবে। এর অন্যথা হলে সেই আইডিয়াটির আসলে কোন মূল্য নেই।

আমাদের চারপাশে নতুন আইডিয়া দেয়ার লোকের আসলে কোন অভাব নেই। তবে একটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এবং সর্বোপরী বাস্তবায়নযোগ্য আইডিয়া প্রণেতার সঙ্কট সর্বএই।

এই সঙ্কট সমাধানকল্পে আইএফডি একজন উদ্ভাবককে তার আইডিয়া সুন্দরভাবে উপস্থাপনের পথ বাতলে দেবে। এক্ষেত্রে আইএফডি সম্ভব সবরকম গাইডেন্স প্রদান করবে এবং একটি সম্ভাবনাময় অথচ অপরিপক্ক আইডিয়াকে পরিপূর্ণ করতে সকল ধরনের সহায়তা প্রদান করবে।

দ্বিতীয়ত, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠানোর জন্য কোন যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। যে কোন ব্যক্তি যে কোন স্থান থেকে যে কোন মাধ্যমে আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে পারেন।

তৃতীয়ত, বর্তমানে আইএফডি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক আইডিয়া আদান প্রদানের প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অন্যান্য অনেক বিষয়ও ধীরে ধীরে এর কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

চতুর্থত, আইএফডির মাধ্যমে কোন আইডিয়া প্রচার করা হলে সেই আইডিয়াটি যে একটি সুষ্ঠু প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, সে ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত থাকবেন। ফলে আইডিয়াটির গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। এখানে বলে রাখা দরকার, আইএফডি যে কোন আইডিয়া পেলেই তা প্রচার করবে না। বরং একটি আইডিয়ার মাধ্যমে সমাজ কতটুকু উপকৃত হতে পারে, সেটাই হবে আইডিয়া নির্বাচন করার মুল ভিত্তি।

এবং পঞ্চমত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল, আইএফডিতে আইডিয়া পাঠাতে হলে উদ্ভাবককে কোন খরচ করতে হবে না, শুধুমাত্র পোস্ট কিংবা ইমেইলের খরচ ছাড়া। এই আইডিয়া যদি প্রচারযোগ্য হয়, তাহলেও উদ্ভাবককে কোন প্রকার ফি বা চার্জ দিতে হবে না।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন এক চিন্তাশীল ব্যক্তি কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া দিলে তা চুরি হয়ে যেতে পারে। ফলে একজন আইডিয়ার উদ্ভাবক বঞ্চিত হবেন তার যথাযথ স্বীকৃতি থেকে।

এক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আইএফডির কাছে কেউ কোন আইডিয়া পাঠালে তা উদ্ভাবকের অনুমতি ছাড়া অন্য কোথাও অন্য কোন নামে ব্যবহার করা হবে না। আমাদের মতে, শুধুমাত্র একজন আইডিয়ার কারিগরের পক্ষেই সম্ভব অন্য আরেকজন আইডিয়ার কারিগরকে যথার্থ মুল্যায়ন করা।

আইএফডি বিশ্বাস করে একটি আইডিয়ার প্রকৃত মুল্যায়ন হয় তখনই যখন তা আংশিক বা পুর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং তা মানুষের কাজে লাগে। এ দিক থেকে আইএফডির একটি সীমাবদ্ধতা রয়েছে। কারণ অনেক উন্নয়নমূলক আইডিয়ার সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার সহ অন্যান্য অনেক সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। তাই আইএফডি এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারবে না যে আইএফডির মাধ্যমে কোন সম্ভাবনাময় আইডিয়া প্রচার হলেই তার সফল বাস্তবায়ন হবে। আইএফডি শুধু আইডিয়া তৈরি এবং প্রচারের প্ল্যাটফর্ম হিসাবেই কাজ করবে। এর বাস্তবায়নের দায়িত্ব আইএফডির নয়।

তবে আইএফডির কার্যক্রম শুধুমাত্র আইডিয়া তৈরি এবং তার প্রচারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। আইডিয়া তৈরি এবং তার সফল বাস্তবায়নের জন্য যেমন প্রয়োজন চিন্তাশীল মানুষ, তেমনি প্রয়োজন সঠিক রাজনৈতিক নের্তৃত্ব, বলিষ্ঠ সরকার কাঠামো, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সর্বোপরী একটি শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক এবং

সামাজিক পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশ না থাকলে চিন্তাশীল মানুষের যেমন জন্ম হবে না, তেমনি অস্থিতিশীল সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশে চিন্তাশীল মানুষদের উন্নয়ন আইডিয়ার যথার্থ মুল্যায়ন এবং বাস্তবায়নও হবে না।

তাই উন্নয়ন আইডিয়া প্রচারের পাশাপাশি আইএফডি এমন একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করবে যার মাধ্যমে যেন সমাজে সৃষ্টিশীল মানুষদের সংখ্যা বাড়ে, তাদের যথার্থ মুল্যায়ন হয় এবং তাদের আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হয়। এই লক্ষ্যে আইএফডি বিভিন্ন ইস্যুতে তার মতামত ব্যক্ত করবে এবং বিভিন্ন রচনা প্রচার করবে।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, আপনি যদি আপনার কোন আইডিয়া নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হোন, এবং মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন এই আইডিয়াটি বাস্তবায়িত হলে সমাজের কিছু কল্যাণ সাধিত হবে, তাহলে আইডিয়াটি আমাদেরকে লিখে পাঠান। এর জন্য প্রাথমিকভাবে ইমেইল করুন আমাদের ঠিকানায়। আমাদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট।

আমাদের বিশ্বাস এই ধরণের আইডিয়া আদান প্রদানের মাধ্যমে সর্বএ নতুন নতুন চিন্তাশীল মানুষের বিকাশ ঘটবে। তাদের চিন্তালব্ধ আইডিয়ার সফল বাস্তবায়ন হলে লাভবান হবেন সকলেই। তাই এর জন্য প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা। আইএফডির মাধ্যমে উন্নয়নমূলক আইডিয়া প্রচারের জন্য যে কোন প্রকার সহযোগিতাকে তাই আমরা স্বাগত জানাই।

©IDEAS FOR DEVELOPMENT (IFD)
ideasfd@gmail.com
www.ideasfd.org

Keyword for Websearch: Exclusive Interview of Khalid Hussain, IFD Exclusive Interview, Stranded Pakistanis in Bangladesh, Geneva Camp Bangladesh, Bihari Repatriation in Bangladesh, Bihari Rehabilitation in Bangladesh, Urdu Speaking Bangladeshi Community, Justice